সাংবিধানিক চেতনায় মুক্তির অন্বেষা

সাংবিধানিক চেতনায় মুক্তির অন্বেষা

মুঃ আবদুল হাকিম

সাংবিধানিক চেতনায় মুক্তির অন্বেষা
মুঃ আবদুল হাকিম

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : অমর একুশে বইমেলা ২০২৪

প্রকাশক
সজল আহমেদ
কবি প্রকাশনী, ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট
২৫৩-২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড, কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
রাসেল আহমেদ রনি

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
৪৮৩-৪৮৬ গাউসুল আজম সুপার মার্কেট নীলক্ষেত ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে বুকস অফ বেঙ্গল বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং কলকাতা

মূল্য : ৪০০ টাকা

Sangbidhanik Chetanay Muktir Anwesha by Md Abdul Hakim Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market 253-254 Dr. Kudrat-e-Khuda Road Kantabon Dhaka 1205 First Edition: February 2024
Phone: 02-44617335 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price: 400 Taka Rs: 400 US 20 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-98112-8-2

ঘরে বসে কবি প্রকাশনীর যেকোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

উ ৎ স র্গ

আমার সহধর্মিণী মিসেস হামিদা বানু
আমার একমাত্র সন্তান অনীক আবরার
আমার একমাত্র কন্যা ফারহাত তামান্না নোভা এবং
আমার পুত্রবঁধূ সাদিকা-তুজ-জহুরা (অরুণা)-কে

ভূমিকা

বইটি কেন লিখলাম? বাঙালি শিক্ষিত যুবসমাজ দিন দিন বইবিমুখ হয়ে যাচ্ছে। পড়তে বললে, বলে বই পড়ে কী লাভ? লাভ বলতে এর ডলার ভ্যালু কত তা সবাই জানতে চায়। লেখাপড়া যেন অধিকাংশ যুবকের কাছে নিছক সময় নষ্ট করা একটি ফালতু কাজ। কারণ, এর কোনো ডলার ভ্যালু নেই। দেশের কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এখন বেকার তৈরির কারখানা। একটা সনদ হাতে ধরিয়ে ক্যাম্পাস থেকে তাকে বের করে দেওয়া হচ্ছে। তার জীবিকা বা রিজিকের দায়দায়িত্ব কেউ নিতে চায় না– না প্রতিষ্ঠান, না রাষ্ট্র। এমন তো হতে পারে না। নাগরিকদের কর্মসংস্থান এবং আয়-উপার্জনের দায়িত্ব আধুনিক রাষ্ট্র কোনোক্রমেই এড়িয়ে যেতে পারে না। আমার অনুমান বাংলাদেশে এস,এস,সি পাশ করা গ্র্যাজুয়েট মানুষের সংখ্যা ৫ কোটির কম হবে না। এদের সকলের কর্পোরেট চাকরি নিশ্চিত করার নিমিত্তে একটি কর্পোরেট অর্থনীতি নির্মাণের জন্য কাজ করাকে আমি আমার নৈতিক দায়িত্ব বলে মনে করি।

ছাত্রজীবনের কষ্টার্জিত জ্ঞান বাস্তব জীবন এবং সমাজ জীবনের কোনো কাজে আসছে না। লেখাপড়া দিয়ে ছাত্রসমাজ না পারছে নিজের জীবন বদলাতে, আর না পারছে পরিবার, সমাজ বা রাষ্ট্র বদলাতে। বেকার শিক্ষিত যুব সমাজের মধ্যে আমি দেখেছি আত্মবিধ্বংসী হতাশা। কেননা অন্ধকার গন্তব্যের পথে আলোর পথের সব যাত্রী। তারা আশার আলো খুঁজছে, যা আমিও সারাজীবন খুঁজেছি এবং এখনও খুঁজছি। সেই বিরতিহীন মত ও পথ অন্বেষার প্রথম প্রয়াস "সাংবিধানিক চেতনায় মুক্তির অন্বেষা" বইটির প্রকাশ। বইটি মুক্তিযুদ্ধের সত্যিকার চেতনার নির্যাস। দলকানাদের টক-শো দেখতে দেখতে অনেকের মত আমিও অনেকটা তালকানা। তাই বইটিকে তালকানার ডায়েরিও বলা যেতে পারে। লালনের কানার হাটবাজারে স্বার্থান্বেষী মহল বেচাকেনা করে আর তালকানারা কাঁদে। সকল সর্বহারার জীবন মফিজের একেকটি গল্পের মত। রাষ্ট্রক্ষমতার মালিক হিসেবে রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিক একজন নীতিনির্ধারক। এজন্য তাকে সংসদ বা কেবিনেটে যেতে হবে, তা নয়। একজন ভোটার হিসেবে নীতিগঠন কার্যক্রমে তাকে অংশ নেয়ার সুযোগ করে দিতে হবে। রাষ্ট্রকে তার মালিক তথা নাগরিকদের সকল দায়িত্ব পালন করতে হবে। রাষ্ট্র নাগরিককে ব্যাধি এবং দুর্ঘটনা মুক্ত করবে। বেকারত্বমুক্ত করে

নাগরিকদের রিজিকের ব্যবস্থা করবে। ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং ব্যক্তিসার্বভৌমত্বের ধারণাটা পাঠকের কাছে পরিষ্কার করতে হবে। রাষ্ট্রকে জনগণের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে হবে। প্রত্যেক নাগরিকের কাছে রাষ্ট্রকাঠামোটা পরিষ্কার করতে হবে।

রাষ্ট্রকে ক্ষমতা ও সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করার জন্য সীমিত ব্যক্তিমালিকানা আইন বানাতে হবে যাতে ক্ষমতা ও সম্পদ অল্প কিছু মানুষের হাতে কুক্ষিগত না হয়। গ্র্যাজুয়েট পাবলিকের দায়িত্ব হবে নলেজ পলিটিক্স দিয়ে গ্যাং পলিটিক্স প্রতিস্থাপন করা। এটা করতে না পারলে তাদের নলেজের কোনো ভ্যালু থাকে না। কর্পোরেট অর্থনীতির বিকাশ না হলে শিক্ষিত যুবকদের কর্মসংস্থান সম্ভব নয়। রাজনীতি নেতাভিত্তিক না করে নীতিভিত্তিক করতে হবে। কেননা নেতাভিত্তিক রাজনীতিতে সর্বদলীয় সমঝোতা সম্ভব নয়। রাষ্ট্রের নীতি-কাঠামো স্বচ্ছ হবে। সমাজকে সন্ত্রাস ও দুর্নীতিমুক্ত করতে হবে। ভোটকে জনগণের নাগরিক অধিকার আদায়ের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। সেজন্য দরকার নেতৃত্বের বিকেন্দ্রীকরণ। মসজিদ থেকে নাইট ক্লাব পর্যন্ত সর্বত্র নেতৃত্ব নির্বাচন করার জন্য ভোট চালু করতে হবে। সর্বদলীয় সমঝোতা নির্মাণের জন্য একটি রাজনীতি কমিশন থাকতে হবে। নির্বাচন কমিশন নির্বাচন বা ভোট ছাড়া আর কোনো কাজ করবে না। ভোটবিপ্লব সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞানার্জনের জন্য এসএসসি পাশ করলেই ছাত্রদের নাম ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। ছাত্রসংগঠন এবং পেশাজীবী সংগঠনগুলো শুধুমাত্র পেশাগত দাবি-দাওয়া আদায়ের মধ্যে সীমিত থাকবে। তারা কোনো রাজনৈতিক দলের অঙ্গ সংগঠন হিসেবে কাজ করবে না। দুর্নীতি কীভাবে দূর হবে তার একটা রূপরেখা সংবিধানে থাকতে হবে। সন্ত্রাস কীভাবে দূর হবে তার একটা রূপরেখা সংবিধানে থাকতে হবে। সংক্ষিপ্ত সংবিধান দিয়ে বাঙালি জাতিকে সুশাসন দেওয়া যাবে না। বাঙালির জন্য যথার্থ হবে বিস্তৃত সংবিধান। সরকারি চাকুরি অপর্যাপ্ত। অথচ বেসরকারি খাতকে শিক্ষিত যুবকদের কর্মসংস্থানের জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছে না। সব দলে যাতে মেধাবী লোকজন নেতৃত্ব অর্জন করতে পারে তার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। এজন্য প্রয়োজন হলে দলগঠন আইন প্রণয়ন করে রাষ্ট্রের সবকিছুকে আইনি কাঠামো, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতার আওতায় আনতে হবে। যোগ্য লোককে যোগ্য স্থানে নিতে হবে। অবাধ তথ্যপ্রবাহ সৃষ্টি করতে হবে।

শ্রেণিসংগ্রাম নয়, বন্দুক নয়, বুলেট নয়, জেহাদ নয়– ভোট বা ব্যালট বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজবিপ্লব সাধন করা সম্ভব। সত্যিকার সংসদীয় গণতন্ত্র এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সমাজে প্রতিষ্ঠার জন্য গ্র্যাজুয়েট জন সংখ্যাকে সংবিধান এবং মানবাধিকার সচেতন করা যাতে তারা আইনের শাসনের মাধ্যমে নিজেদের ভাগ্য নিজেরাই গড়ে নিতে পারে। তাদের সারাজীবন বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত রাখা। ভাববাদ এবং বস্তুবাদকে বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকাণ্ডের সাথে সমন্বিত করা। দলীয়

রাজনীতির পাশাপাশি নির্দলীয় রাজনীতির ধারা প্রবর্তন করা। রাজনীতিকে প্রতিযোগিতামূলক এবং জ্ঞানভিত্তিক করা। ঘৃণা-বিদ্বেষ, সংঘাত-সংঘর্ষ পরিহার করা; যুদ্ধবিরোধী মনোভাব সৃষ্টি করা। রাজনীতিতে উদার মনোবৃত্তি এবং পরমতসহিষ্ণুতার সংস্কৃতি চালু করা।

সংসদীয় গণতন্ত্রের স্বাদ শুধু রাজনীতিবিদ তথা নেতারা পাচ্ছে। অন্যদিকে স্বাদ পাওয়া তো দূরের কথা, কর্মীরা বলির পাঁঠা হয়ে মারা যাচ্ছে। ছাত্র-শিক্ষক, কৃষক-শ্রমিক এবং বুদ্ধিজীবীরাও সংসদীয় গণতন্ত্রের কোনো স্বাদ পাচ্ছে না। সংসদীয় গণতন্ত্র ছাত্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে পারছে না, কৃষক-শ্রমিকদের শোষণ বন্ধ করতে পারছে না, শ্রেণিবৈষম্য, সামাজিক বৈষম্য এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করতে পারছে না। সমাজ থেকে সন্ত্রাস ও দুর্নীতি দূর করতে পারছে না।

এদেশে রাজপথে সবসময় শক্তির মহড়া চলে। রাজপথে যারা জয়ী তারা ক্ষমতাসীন হয় এবং ক্ষমতায় টিকে থাকে। এটা সত্য যে, বুর্জোয়া গণতন্ত্রে রাষ্ট্রের নীতি-সিদ্ধান্তগুলো ধনীরা টাকা দিয়ে নেতাদের কাছ থেকে কিনে নিতে পারে। এদেশে কোনো দলের ভিতর গণতন্ত্রের অনুশীলন নেই। মসজিদ কমিটি থেকে শুরু করে গুলশান ক্লাব পর্যন্ত কোথাও ভোটের মাধ্যমে নেতৃত্ব নির্বাচিত হয় না। ফলে আমজনতা গণতন্ত্রের সুফল ঘরে তুলতে পারছে না।

সাংসদদের জবাবদিহিতার জন্য প্রত্যেক ইউনিয়নে একটি ভোটার সমিতি গঠন করা যেতে পারে যাদের কাছে একজন সাংসদ ৩ মাস বা ৬ মাস পর পর তার কর্মকাণ্ড ব্যাখ্যা করবেন। ভোটারকে তার ভোট ফিরিয়ে নেয়া বা রিকল করার ক্ষমতা দিতে হবে। দলীয় ইশতেহারে জনগণকে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় তা যাতে কোনো দল ভঙ্গ করতে না পারে তার জন্য প্রত্যেক জেলায় একটি করে মানবাধিকার আদালত গঠন করা যেতে পারে। সেবা পেতে হয়রানি হলে জনগণ যেন সেখানে মামলা করতে পারে। ক্ষমতা অনুপাতে জবাবদিহিতার কাঠামো মজবুত করতে হবে। তথ্য এবং উচ্চশিক্ষাকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়ার জন্য তথ্য এবং উচ্চশিক্ষা কমিশন গঠন করা যেতে পারে।

একজন নাগরিককে কোনো রাষ্ট্রে অসীম সম্পদ অর্জন করার ক্ষমতা দেওয়া যায় না। আইনে এ সুযোগ থাকলে রাষ্ট্র স্বার্থান্বেষী মহলের রাহুমুক্ত হতে পারবে না। একমাত্র আধুনিক রাষ্ট্রই পারে রক্তক্ষয়ী শ্রেণিসংগ্রাম ছাড়া ব্যক্তিমালিকানা সীমিত করতে। এখানে বড় বাধা হতে পারে বিশ্বপুঁজি। সংসদীয় গণতন্ত্রে কৃষক-শ্রমিকদের স্বার্থ দেখার জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থাকতে পারে এবং তাদের ভোটে তারা রাষ্ট্র ক্ষমতায় যেতে পারে। সর্বহারার একনায়কতন্ত্রের তত্ত্ব ব্যবহার করে অনেক স্বৈরশাসক জনগণের সার্বভৌমত্ব খর্ব করে যুগ যুগ ধরে দেশ শাসন করছে। অন্যদিকে একনায়ক হবার জন্য একজন সর্বহারা আরেকজনকে খতম

করছে এবং একইভাবে নিজেও খতম হয়ে যাচ্ছে। এজন্য জাতিসংঘ ঘোষিত মানবাধিকারের তালিকা আরও লম্বা করতে হবে।

সংসদ যদি সম্পদ অর্জনের সর্বোচ্চ সীমারেখা বেধে দিতে পারে তাহলে তো আর শ্রেণি সংগ্রামের প্রয়োজন হয় না। প্রশ্ন হল, কোনো সংসদ এটা পারে না কেনো? কারণ, প্রচুর টাকা খরচ করে এমপি হলে একজন অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাধ্য হয় লোভের চোরাবালিতে ডুবে যেতে। জবাবদিহিতার কাঠামো মজবুত হলে লোভী নেতা এ লাইনে পা দেবে না। নেতারা শুধু ভোটারদের কাছে নয়, কর্মী এবং সাংবাদিকদের কাছেও জবাবদিহিতা করতে বাধ্য থাকবে। সিভিল সমাজ বা বুদ্ধিজীবীদের কাজ হবে এসব কাঠামো তৈরি করতে দিনরাত কাজ করা। বাঙালি বুদ্ধিজীবীগণ জনস্বার্থে আন্তরিকভাবে কাজ করলে সংসদীয় গণতন্ত্রের পথ ধরে শ্রেণিসংগ্রাম বা রক্তপাত ছাড়াই সমাজবিপ্লব ঘটাতে পারে। সংবিধানটাই হবে সার্বভৌম জনগণের কাছে নেতা বা রাজনীতিবিদদের স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতার মূল কাঠামো।

বইটি মূলত বিভিন্ন অনলাইন পত্রিকায় প্রকাশিত আমার লেখা প্রবন্ধগুলোর সংকলন। ভুলত্রুটি মার্জনীয়।

পরিশেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি আমার বন্ধুমহলকে যারা দীর্ঘদিন থেকে একটা বই লেখার জন্য বারংবার আমাকে তাগিদ দিয়ে আসছিল। বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ব্যাচমেট ও বন্ধুবর শেখ মোঃ কাবেদুল ইসলাম (কবি, গবেষক ও ছোটগল্পকার 'কাবেদুল ইসলাম') এবং ব্যাচমেট ও কবি মোঃ আমিনুল ইসলামকে। চূড়ান্তভাবে প্রুফ দেখাসহ বইটি প্রকাশনা সংক্রান্ত যাবতীয় দায়িত্ব পালন করেছেন কাবেদুল ইসলাম। তিনি 'কবি প্রকাশনী'র স্বত্বাধিকারী জনাব সজল আহমেদকে বইটি আগামী বইমেলায় প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেছেন। কাজেই তাকে-সহ কবি প্রকাশনীর সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই, কেননা তাদের হাতে বইমেলার অনেক কাজ থাকা সত্ত্বেও তারা বইটি প্রকাশ করার গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

লেখার জন্য আমাকে আলাদা সময় বরাদ্দ করার জন্য সবার শেষে আমি কৃতজ্ঞ আমার পরিবারের কাছে। তারা বারবার জানতে চায় বইটি কখন প্রকাশ হবে। আমার সহধর্মিণী মিসেস হামিদা বানু, আমার একমাত্র সন্তান অনীক আবরার, আমার একমাত্র কন্যা ফারহাত তামান্না নোভা এবং আমার পুত্রবঁধূ সাদিকা-তুজ-জহুরা (অরুণা) অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে প্রকাশিত বইটি হাতে পাওয়ার জন্য।

সূ চি প ত্র

সাংবিধানিক জ্ঞান, তথ্য, গবেষণা এবং উচ্চশিক্ষা কমিশন	১৩
সাংবিধানিক রাজনৈতিক কমিশন	২৫
সাংবিধানিক স্থানীয় সরকার কমিশন	২৯
সাংবিধানিক দুর্নীতি ও অপরাধ দমন কমিশন	৩৪
পেশাদারত্ব এবং পেশাজীবীত্বের উন্নয়নের জন্য পেশাভিত্তিক উচ্চকক্ষ	৪০
মানবাধিকার রক্ষায় স্বাধীন, নিরপেক্ষ ও নির্দলীয় বুদ্ধিজীবীত্বের অনুশীলন	৪৫
পৃথক বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে গুণগত মানের সমাজবিজ্ঞান চর্চা	৫৩
সংবিধানে রাষ্ট্রক্ষমতা ও নাগরিক ক্ষমতার ভারসাম্য এবং রাষ্ট্রের জবাবদিহিতা	৫৯
রাজনৈতিক শৃঙ্খলা, প্রতিযোগিতামূলক স্বচ্ছ রাজনীতি এবং স্বচ্ছ নির্বাচন	৭৩
সর্বদলীয় সমঝোতার মাধ্যমে সমাজ ও রাষ্ট্র সংস্কার	৮০
সংবিধান এবং রাজনীতিবিদদের জবাবদিহিতা	৮৪
জনস্বার্থ এবং রাজনীতির গতি-প্রকৃতি	৯০
প্রশাসনিক সংস্কার এবং স্বার্থান্বেষী মহল	৯৬
শিক্ষিত বেকারদের কর্মসংস্থান এবং কর্পোরাটাইজেশন	১০২
টেকসই উন্নয়ন এজেন্ডা এবং মানবসম্পদ উন্নয়ন	১০৬
বাঙালির মানবসম্পদ উন্নয়ন নীতি এবং শিক্ষিত বেকার	১১০
বাংলাদেশে আইনের শাসন এবং আইন প্রণয়ন সংস্কৃতি– সমস্যা এবং সম্ভাবনা	১১৫
ধর্মনিরপেক্ষতা এবং নাগরিক সার্বভৌমত্ব সংক্রান্ত ভুল বুঝাবুঝি নিয়ে কিছু কথা	১২৪
সরকারি নীতিনির্ধারণ এবং স্বার্থান্বেষী মহল বনাম ওয়াকিবহাল মহল	১৩৪
গণপ্রত্যাশার আলোকে জনপ্রশাসন	১৩৯
চিন্তার বাজার	১৪২
কালো টাকা সমীক্ষা এবং কর্মসংস্থানে তার সদ্ব্যবহার	১৪৬
সহজ ব্যবসার জন্য কর্পোরেট ট্যাক্স এবং ভ্যাট	১৫৩
শেয়ার বাজার চাঙ্গা করার জন্য কতিপয় প্রস্তাব	১৫৮

সাংবিধানিক জ্ঞান, তথ্য, গবেষণা এবং উচ্চশিক্ষা কমিশন

বিগত ৫০ বছরে আমরা প্রচুর অবকাঠামো উন্নয়ন করেছি। রাস্তা-ঘাট, ব্রিজ-কালভার্ট এবং আকাশচুম্বী অট্টালিকার এত উন্নয়ন হয়েছে যে আগামী ৫০ বছর এ খাতে একটু কম উন্নয়ন করলেও দেশ চলবে। এ খাতে উন্নয়ন করলে জমি, রড, সিমেন্ট, বালি এবং অন্যান্য নির্মাণসামগ্রীর দাম হু হু করে বাড়ে। এখন সবার আগে দরকার মানুষের উন্নয়ন। অর্থাৎ আমাদের সংবিধানে বর্ণিত সদিচ্ছাপ্রণোদিত নাগরিক তথা মানবসম্পদ উন্নয়ন যা হবে নাগরিক ক্ষমতায়নের মূলসূত্র। অ্যাকাডেমিয়ার প্রতিভা ছাড়া স্বার্থান্বেষী মহল সামাল দেওয়া অসম্ভব। উন্নয়নের মূল চালিকা শক্তি উন্নীত মানুষ। অর্থাৎ এমন মানুষ সৃষ্টি করতে হবে যাদের চাকুরির গ্যারান্টি থাকবে, কিন্তু তারা বিদেশে টাকা পাচার করবে না, ব্যাংক লুট করবে না, শেয়ার মার্কেট লুট করবে না, প্রকল্পের টাকা নয়-ছয় করবে না, নিয়োগ বা টেন্ডার বাণিজ্য করবে না, গ্রেফতার বা জামিন বাণিজ্য করবে না। যদি কেউ করে তবে সে কোনোভাবেই পার পাবে না। তাদের মেধায় এবং আয়ে স্বচ্ছতা থাকবে। তাহলে মানুষের দাম হু হু করে বাড়বে। এজন্য সবার আগে দরকার সোনার বাংলার সোনার মানুষের রাজনীতি। বিশুদ্ধ জ্ঞান, বিশুদ্ধ তথ্য এবং বিশুদ্ধ গবেষণা ছাড়া বিশুদ্ধ এবং যোগ্য মানুষ তৈরি করা যাবে না। জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতার মূলনীতির ভিত্তিতেই সোনার মানুষ তৈরি করা সম্ভব। এজন্য লাগবে স্বাধীন গণমাধ্যম, স্বাধীন সোশাল মিডিয়া, স্বাধীন সামাজিক বিজ্ঞান পরিষদ, স্বাধীন বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ এবং স্কুল ইত্যাদি। এজন্য এসব কাজগুলো মন্ত্রণালয় থেকে কমিশনে নিতে হবে। বিশুদ্ধতা আনার জন্যই সাংবিধানিক পদের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় দলীয় বিবেচনার কোনো অবকাশ রাখা সমীচীন নয়।

বর্তমানে তথ্য নিয়ে কাজ করছে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, তথ্য অধিদপ্তর, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল, প্রেস ইন্সটিটিউট অফ বাংলাদেশ, বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা, গণমাধ্যম ইন্সটিটিউট, বাংলাদেশ বেতার, বাংলাদেশ টেলিভিশন, তথ্য কমিশন, পরিসংখ্যান এবং তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ। প্রতিটি সরকারি এবং আধা-সরকারি অফিসে তথ্য সংগ্রহ এবং সংরক্ষণের জন্য শাখা আছে, কিন্তু কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবেও এর সাথে সম্পৃক্ত নয়। অর্থাৎ সিলেবাস বা কারিকুলাম এবং

আমলের মাঝে বিস্তর ফারাক। সর্বোচ্চ মানের শিক্ষক নিয়োগ দিতে চাইলে এ নিয়োগ আর বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে রাখা সমীচীন নয়। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের হাতেও এটি নেই। জ্ঞান, তথ্য এবং শিক্ষাকে দলীয় রাজনীতির প্রভাবমুক্ত রাখার জন্য সাংবিধানিক উচ্চশিক্ষা কমিশনকে এ নিয়োগের দায়িত্ব অর্পণ করা যেতে পারে। তবে দলীয় সরকার শিক্ষা এবং তথ্য আইনের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে সেটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে পারবে না। সকল সাংবিধানিক কমিশনের ক্ষেত্রে দলীয় সরকারের এ জাতীয় নিয়ন্ত্রণ থাকবে। রাজপথ দখল এবং শোডাউনের রাজনীতিতে সংঘাত এবং রক্তপাত অনিবার্য। 'হয় মারো, নয় মরো'– এভাবে জীবিত মানুষকে লাশ বানানো কোনো সুস্থ রাজনৈতিক দর্শন হতে পারে না। এতে দলীয় কর্মীদের রাজনৈতিক মতাদর্শের নামে নরবলি দেওয়া হয়। দুর্নীতি এবং লুটপাটের পথ সুগম করার জন্য এখানে জনগণকে বলির পাঁঠা হিসেবে ব্যবহার করা হয় মাত্র। রাজনীতি প্রকৃতপক্ষে ভাল আইন এবং পলিসি তৈরির পেশা, যা সামাজিক বিজ্ঞানের ব্যাপক গবেষণা ছাড়া অসম্পূর্ণ। এটি একটি বুদ্ধিবৃত্তিক পেশা যার সাথে থাকতে হবে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের সার্বক্ষণিক অংশগ্রহণ এবং নজরদারি। এটি খুন হওয়া এবং খুন করার পেশা নয়। এটি ভোগের পেশা নয়। ত্যাগের পেশা। আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক দেউলিয়াপনার জন্য আমাদের রাজনীতি নলেজ পলিটিক্স থেকে ক্রমশ গ্যাং পলিটিক্সে রূপান্তরিত হচ্ছে। মেধা নয়, গায়ের শক্তি বা মার দেওয়ার শক্তি দেখে পদ দেওয়া হচ্ছে। বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ দিয়েই এটাকে আবার নলেজ পলিটিক্সে ফিরিয়ে আনতে হবে। লোভ রিপুর চর্চামুক্ত করতে হলে রাজনীতিকে আর্থিক সংশ্লিষ্টতা মুক্ত করতে হবে। এজন্যই দেশে স্বাধীন এবং সাংবিধানিক উচ্চশিক্ষা কমিশন অপরিহার্য।

দেশের বৃহত্তর স্বার্থে সর্বদলীয় সমঝোতা বা কন্সেন্সাস ছাড়া সংবিধানে এ জাতীয় কমিশন গঠন করা সম্ভব নয়। তা না হলে আগের মত সংঘাত, সংঘর্ষ এবং রক্তপাত অব্যাহত থাকবে। এখন রাজনীতি করা মানে জীবন বাজি রাখা। এক্ষেত্রে সন্ত্রাসীদের সাথে পাল্লা দিয়ে ভাল মানুষ টিকে থাকতে পারে না। রাজনীতির সুস্থতা এবং বিশুদ্ধতা নির্ভর করছে দলগুলো লোভ সংশ্লিষ্ট ক্ষমতাগুলো ছাড়তে মানসিকভাবে কতটুকু প্রস্তুত তার উপর। ছাড় দেওয়ার মানসিকতা না থাকলে সব দলের কাছে গ্রহণযোগ্য প্রশাসন এবং বিচার কায়েম করা যাবে না।

এটি মানবসম্পদ উন্নয়ন কমিশন হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে জ্ঞান-মন্দির বানাবে এবং সকল শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য সিলেবাস বা কারিকুলাম প্রস্তুত করবে। সিলেবাসের জন্য দেশে আলাদা কোনো কারিকুলাম বোর্ড থাকবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্জিত জ্ঞান, মেধা এবং প্রজ্ঞার মাধ্যমে জনগণ প্রভূত কল্যাণ লাভ করবে। এরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নিয়োগ-পদোন্নতির দায়িত্বপালন করবে। এরা ছাত্রদের কর্মসংস্থানের সর্বাত্মক দায়িত্ব পালন করবে। এরা প্রাইভেট সেক্টরের

সাথে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ছাত্রদের কর্মসংস্থানের মহাপরিকল্পনা প্রস্তুত করবে। সরকার এবং রাজনৈতিক দলগুলোকে স্বচ্ছ এবং দায়বদ্ধ করতে প্রয়োজনীয় অ্যাকাডেমিক উদ্যোগ গ্রহণ করবে। এরা জনসংযোগ, গণমাধ্যম এবং সামাজিক মাধ্যমের সমন্বয়ক হিসেবে কাজ করবে যাতে কোনো দল এদেরকে নিজেদের স্বার্থে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারে কিংবা কোনো স্বার্থান্বেষী মহল এদেরকে যেন প্রোপাগান্ডা মেশিনের মত ব্যবহার না করে; যাতে দলীয় সরকার এবং রাজনৈতিক দলগুলো এদের মাধ্যমে জনগণকে ভুল সংকেত দিতে না পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষকগণ জ্ঞানার্জনের অংশ হিসেবে জনগণের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহে সর্বদা ব্যস্ত থাকবে এবং গণসম্পৃক্ত থাকবে। শিক্ষকদের সাহায্য নিয়ে তারা জনগণের কাছে মানবাধিকার, আইনের শাসন এবং সংবিধানের গ্রহণযোগ্যতা ব্যাখ্যা করবে।

কোনো সন্ত্রাসী চক্র বা স্বার্থান্বেষী মহল তাদের কর্মকাণ্ডে ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারবে না। সন্ত্রাস এবং দুর্নীতির অপকারিতা তারা জনগণের কাছে চমৎকারভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করবে। সেইসাথে তারা খারাপ মানুষ বা ক্রিমিনালদের প্রফাইল প্রস্তুত করবে। জনগণ এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে কোনো দেয়াল থাকবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে জনগণের নিবিড় এবং অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক স্থাপিত হবে। এ কমিশন সরকারি, আধা-সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় তথ্যের ফরম্যাট তৈরি করবে। এ কমিশন হবে সকল নির্ভুল সেকেন্ডারি তথ্যের ডিপো। দেশের সকল তথ্য-উপাত্তের সংগ্রহ এবং সংরক্ষণের দায়িত্ব তাদের। তারা এই তথ্য-উপাত্ত প্রাইভেট সেক্টরে বিক্রি করতে পারে। তারা এসব তথ্য-উপাত্ত এবং জ্ঞান গবেষণার ফলাফল চাহিদামাফিক গণমাধ্যমে সরবরাহ করবে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সরবরাহ করবে। গোপনীয়তার কোনো দেয়াল থাকবে না। এ কমিশন অবাধ জ্ঞান এবং তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিত করবে। তথ্য পেতে কাউকে বেগ পেতে হবে না। জ্ঞানী-গুণীরা জনস্বার্থে এ সকল তথ্য-উপাত্ত নিয়ে দিনরাত গবেষণা করবেন। এসব ক্ষেত্রে দলীয় সরকারের কোনো হস্তক্ষেপ থাকবে না। একটি সাংবিধানিক কমিশন আরেকটি সাংবিধানিক কমিশনের কার্যক্রমে সর্বাত্মক সহযোগিতা অব্যাহত রাখবে।

জ্ঞান, তথ্য, গবেষণা এবং উচ্চশিক্ষা কমিশন তাদের বিচক্ষণতা, প্রজ্ঞা, অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতা দিয়ে বাংলাদেশকে উন্নয়ন এবং সুশাসন উপহার দেবে। তারা নিশ্চিত করবে প্রতিটি বিশ্ব র‍্যাংকিং-এ বাংলাদেশ যেন উপরের দিকে থাকে। বাংলাদেশের সকল মেধা, সততা, দক্ষতা এবং দেশপ্রেমকে তারা উন্নয়নের কাজে লাগাবে যাতে নাগরিক জীবন উন্নত, সুন্দর, সাবলীল এবং সুখময় হয়ে যায়। কোটি কোটি তথ্য, উপাত্ত, জ্ঞান ও গবেষণায় তারা দেশকে ভরে দেবে। প্রতিটি কাজের জন্য তারা নাগরিক আদালত এবং সংসদে জবাবদিহিতা করবে। গণমাধ্যমের

কাছে কোনো তথ্য তারা লুকিয়ে রাখবে না। সকল তথ্য এবং জ্ঞান তারা জনগণের অবগতির জন্য গণমাধ্যমে প্রকাশ করবে, যাতে দেশের মালিক হিসেবে প্রত্যেক নাগরিক সঠিক তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম হয়। যাতে কোনো নাগরিক ধর্ম বা দল কানা না হয়। তারা দেশকে দিকনির্দেশনা দেবে। আগামী প্রজন্ম তাদের চিন্তা-চেতনা ও যত্নে লালিত-পালিত হবে। প্রত্যেক নাগরিককে তারা দেশমুখী এবং উন্নয়নমুখী করবে। জ্ঞান ও তথ্যের মহিমাকে তারা সবার উপরে স্থান দেবে। জ্ঞান ও তথ্যকে তারা কারো স্বার্থে বিকৃত করবে না।

বিজ্ঞানমনস্কতাকে তারা উৎসাহিত করবে। তাদের হাতে থাকবে সত্যিকার জ্ঞানের আলো। সেই আলো সর্বদা প্রজ্বলিত রেখে তারা পথ চলবে। জনগণের সকল তথ্য তাদের হাতে থাকবে। তথ্য, জ্ঞান এবং গবেষণার মাধ্যমে কমিশন রাষ্ট্রকে জবাবদিহিতার রাডারে আবদ্ধ রাখবে। তথ্য, জ্ঞান ও গবেষণার ফলাফলের জন্য গণমাধ্যম তাদের কাছে ধরণা দেবে। কোনো স্বার্থান্বেষী মহল জ্ঞান ও তথ্যের দখল নিয়ে দেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারবে না। তারাই দেশে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার সূচনা করবে এবং তা অনুশীলন করবে। জনগণকে সজাগ ও সচেতন করবে। গ্র্যাজুয়েট পপুলেশন কমিশনের রিজার্ভ ফোর্স হিসেবে কাজ করবে। তারা শিক্ষার বিশ্বমান বজায় রাখবে। সারা পৃথিবীর যাবতীয় জ্ঞান, তথ্য এবং গবেষণাকে তারা ধারণ করার চেষ্টা করবে। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে তারা মানুষ তৈরির শ্রেষ্ঠ কারখানায় রূপান্তরিত করবে। তারা শুধু উচ্চশিক্ষিত মানুষ তৈরি করবে না, তাদের যথাযথ কর্মসংস্থানের বন্দোবস্তও করবে। কর্মসংস্থানও তাদের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত থাকবে যাতে একজন উচ্চশিক্ষিত মানুষও দেশে বেকার জীবনযাপন না করে।

প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মসংস্থান বিভাগ থাকবে। তারা উচ্চশিক্ষা কমিশনের সাথে সমন্বয় করে সবার কাজের ব্যবস্থা করবে অথবা অন্তরর্তীকালীন ভাতার ব্যবস্থা করবে। প্রত্যেক গ্র্যাজুয়েট শিক্ষানুসারে এই ভাতা পাবে। কেউ বঞ্চিত হবে না। দেশে অথবা বিদেশে তাদের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করার ব্যবস্থা করতে হবে। দেশের সকল সমস্যার সমাধানের ফর্মুলা তারা বের করবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ ছাত্র-শিক্ষক নির্দলীয় এবং নিরপেক্ষ অবস্থান নেয়ার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকবে। সকল দলের মধ্যে এ বিষয়ে একটি কনসেন্সাস থাকতে হবে। সামরিক এবং বেসামরিক আমলাতন্ত্রকেও এই জ্ঞান, তথ্য এবং গবেষণা প্রক্রিয়ার সাথে ধীরে ধীরে সম্পৃক্ত করতে হবে। বাংলাদেশকে সন্ত্রাসের পথ থেকে জ্ঞানের পথে আনার ক্ষেত্রে এর কোনো বিকল্প নেই। রাষ্ট্রের শক্তিশালী স্তম্ভ হিসেবে অ্যাকাডেমিয়াকে গড়ে তুলতে ব্যর্থ হলে দেশের স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্ব বিপন্ন হতে পারে। দেশের বৃহত্তর স্বার্থে সামরিক এবং বেসামরিক আমলাতন্ত্রকেও উচ্চশিক্ষার পৃষ্ঠপোষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিশুদ্ধ চর্চাকে পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে দেশে ব্যবসা ও বিনিয়োগবান্ধব অর্থনীতি নির্মাণ করতে